

যা হলে তা হলে বাণিজ্য ভারসাম্য ভারতের দিকে চলে গেল। অবশ্য এ ভারসাম্য কখনও বাংলাদেশের পক্ষে ছিল না। এখানে মাত্রার কথা বলা হচ্ছে। বাংলাদেশে গত তিন বছরে টাটার যত বাস, প্রায় অচল কালো ট্যান্ডি ও সিএনজি এসেছে তা আগে কখনও আসেনি। কারা আমদানি করেছে সেগুলো? বিএনপি পক্ষভুক্ত ব্যবসায়ীরা যাদের নিশ্চয় বিভিন্ন মহলে কিছু দিতে হয়েছে। আর কোন কোন সরকারের আমলে ভারত এত বাণিজ্যিক সুবিধা পেয়েছে? একটি পরিসংখ্যা দেখুন। ড. আবুল বারাকাত আমাকে জানিয়েছেন, '৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যের শতকরা ১৫ ভাগ ছিল ভারতের যা আগের থেকে ছিল বেশি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সে হার দাঁড়ায় ১২ ভাগে পরে ১১ ভাগে, ১৯৯৯ সালের দিকে ১২ ভাগে। অর্থাৎ শেখ হাসিনা ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনেছিলেন। জোট ক্ষমতায় আসার পর অর্থনীতিবিদরা জানাচ্ছেন সে হার এখন ১৫ থেকে ১৯ ভাগে পৌঁছেছে। সিংহভাগ আমদানিকারক আওয়ামী পক্ষের নয়। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি এখন সর্বোচ্চ, প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার। মোরশেদ খানরা প্রয়োজনে এসব পরিসংখ্যান ভুলে যান। আরও আছে, ভারতবিরোধী জামায়াত মন্ত্রী নিজামী বাংলাদেশে ভারতের টাটা কোম্পানির ২০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ পাকা করে ফেলেছিলেন। এতে খুশি হওয়ার কিছু ছিল না। অস্তিমে বাংলাদেশের ক্ষতি কত হতো তা হিসাব করে বলতে পারবেন অধ্যাপক বারাকাত বা ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এবং এ বিষয়টির দিকে কেউ-ই নজর দেয়নি। কিন্তু গ্রেনেড হামলার পর টাটা এতে থমকে যায়। নিজামী ক্ষুব্ধ হন। বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, অপরাধমূলক হরতালের জন্য দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সেটিই বিনিয়োগে বাধা। শব্দটি লক্ষ্য করুন 'অপরাধমূলক'। ওই ব্যক্তিটির মতে, তা হলে সন্ত্রাস বা গ্রেনেড হামলা ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। হরতাল হয় জেনেও টাটারা এগিয়েছিল, গ্রেনেড হামলার পর থমকে গেছে। যে দেশ থেকে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ভয়ে চলে যান সেখানে সাধারণ বিনিয়োগকারী কী ভরসায় আসবেন? এটা নীতিনির্ধারকরা বোঝেন না? বোঝেন। কিন্তু তখন দোস্তি ছিল। শোনা গেছে, হাইকমিশন থেকেও রিপোর্ট গিয়েছিল, হিন্দুরা খুব ভাল আছে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে। যে ব্যক্তিটি এ ধরনের রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাকে কিছুদিন আগে ফেরত নেয়া হয় বলে শুনেছি। কারণ বোধহয় সরকার যে মৌলবাদী এটা এখন দিবালোকের আলোয় স্পষ্ট। মোহাম্মদ হাসান সাংবাদিক যাকুল হাফিজ মন্ডল

পররাষ্ট্র দফতরের যে রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছেন তাতে স্পষ্ট করে এসব বৃত্তান্ত লেখা আছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন ও সরকারের আরেক পার্টনার ইসলামী এক্যাজেটের সঙ্গে সন্ত্রাসী সংগঠন হরকাতুল জিহাদের সম্পর্ক আছে। মোরশেদ খান সেই রিপোর্টের কঠোর প্রতিবাদ জানালে খুশি হব।

নতুন যে অসাম্প্রদায়িক সরকার এসেছে ভারতে তারা স্বাভাবিকভাবেই কোন প্রতিবেশী দেশে মৌলবাদী সরকার পছন্দ করবে না। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে মোশাররফের কারণে যিনি বাধ্য হচ্ছেন মৌলবাদী দমনে মাদ্রাসাগুলোকে লাইসেন্স নিতে বলেছেন। মোশাররফ বুঝেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়ে সুবিধা হবে না। এহেন পরিস্থিতিতে মোরশেদ খান হঠাৎ চটে গেছেন ভাবলে ভুল হবে। যা করেছেন ওপরের নির্দেশে, বস্তাপচা পুরনো পাকিস্তানি প্যাটার্নে। অর্থাৎ জোট এখন বেকায়দায়। পুরনো মিত্র ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র আগের মতো একসুরে কথা বলছে না। মার্কিনি কর্মকর্তা যা বলছেন তা এখন ধমকই প্রায়। মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত। বহুধাভিত্তক বিরোধী জোট এখন একের পথে, এক্যবদ্ধ কর্মসূচি দিচ্ছে। সুতরাং মানুষ সব আন্দোলনে গেলে কী হবে? বিশ্বের অধিকাংশ দেশ বাংলাদেশ নিয়ে শংকিত। বিরোধী আন্দোলন তারা সমর্থন করবে। সুতরাং জনমতকে ভিন্নপথে ভারতবিরোধী কার্ড বা ব্লেকার্ড বা ইন্ডিয়া কার্ড খেলাটাই ভাল মনে করছে জোট সরকার। ইতিমধ্যে ছাত্রদল-শিবির ঘোষণা করছে, ভারতীয় সেনা এলো বলে, তাদের রুখতে হবে। অর্থাৎ মৌলবাদীরা জাগো, ইসলাম বিপন্ন, হিন্দু ভারত ঠেকাও। তারপর আবার সীমান্তে বোমাবোমা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মোরশেদ খান বাংলাদেশের স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

খান সাহেবরা ভারত থেকে যা আদায় করতে চাচ্ছেন তা কি হুমকি দিয়ে পারবেন? নাকি আলাপ-আলোচনা করে পারেন? সচিব পর্যায়ের দুটি বৈঠকের ফলাফল কী? খান সাহেবের ধমকের পর সবাই ধরেই নিয়েছিল ফলাফল এমনই হবে। লড়াই করে যদি পারেন করেন, আমরা সঙ্গে আছি। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে शामिल হব। ভারতের সব আমদানি বন্ধ করে, সীমান্ত বন্ধ করে ভারতকে ভাল একটা শিক্ষা দিন। আছি আমরা আছি। কিন্তু আবার যেন না দেখি আমাদের চারদিক ফাঁকা। আপনারা উধাও হয়ে গেছেন। সিংহনাদ যেন হঠাৎ মার্দারশাবকের মিউ মিউ না হয়ে যায়। যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে নিজেদের ক্ষমতায় রাখার স্বার্থে একটি খেলা খেলছেন এবং এই খেলায় আপনারদের ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে বাংলাদেশের ও বাংলাদেশের মানুষের। যেটা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকেই হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের সরকার, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখে যা লোটর লুটে নিয়েছেন, বলি দিচ্ছেন এখন আমাদের। আমরা এবার দেখতে চাই, যে ব্লেকার্ড বা ইন্ডিয়া কার্ড খেলছেন সেটা খেলে যান, নিজের জায়গায় থাকুন সেটা যেন আবার জোকের কার্ড না হয়ে যায়।

মুনতাসীর মামুন : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক কতিপয় ভারতীয় সংবাদপত্রের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ

ভারতীয় সংবাদপত্রের একটি অংশ ২১ আগস্টের পর থেকেই বাংলাদেশের কুৎসা রটনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশের মাধ্যমে এই কুৎসা রটনার শুরু। সম্পাদকীয় দুটি হচ্ছে— খালেদার পরিকল্পনা : হাসিনাকে হত্যা কর এবং গণতন্ত্র বিতাড়িত কর (খালেদাস গেম প্লান : কিল হাসিনা এন্ড ভ্যানিশ ডেমোক্রেসি) এবং হাসিনার সঠিক অবস্থান গ্রহণ : খালেদা প্রকৃত ইস্যু ভিন্ন খাতে সরানোর চেষ্টা করছে (রাইট মুভ বাই হাসিনা : খালেদা ট্রায়িং টু ডিফ্লেক্ট দ্য রিয়েল ইস্যু)। সি রাজা মোহনের লেখা একটি কলামও প্রকাশ করে দ্য হিন্দু পত্রিকা। প্রায় একই সময়ে দ্য আউটলুক পত্রিকা মার্কিন

সন্ত্রাস প্রতিরোধ বিষয়ক দফতরের সমন্বয়কারী কফার ব্লাকের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে এবং সন্ত্রাসের বিষয় : উপমহাদেশে ইসলামী মৌলবাদ দ্রুত শেকড় ছড়াচ্ছে (দ্য ভেনম অব টেরর : ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম ইজ ফাস্ট স্প্রেডিং ইটস টেনটাকলস অ্যাক্রস দ্য সাবকন্টিনেন্ট) শিরোনামে একটি নিবন্ধও প্রকাশ করে। এর আগে ২৬ আগস্ট নয়াদিল্লির ইসটিটিউট ফর কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টে কর্মরত আনন্দ কুমার নামে এক ব্যক্তি ‘সন্ত্রাসের মাঝে গণতন্ত্র (ডেমোক্রেসি ইন টেরর)’ শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। অতি সম্প্রতি বিভূতিভূষণ নন্দী দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ‘বাংলাদেশে সন্ত্রাস (বাংলাদেশ টেরর)’ শিরোনামে দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

প্রথমে স্টেটসম্যানের কথাই ধরা যাক। স্টেটসম্যানের মতো ১২৯ বছরের প্রকাশনার ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এবং দায়িত্বশীলতার জন্য খ্যাত একটি পত্রিকা কিভাবে সরাসরি বলতে পারে যে, প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেত্রীকে হত্যা করে গণতন্ত্র বিতাড়িত করতে চাইছেন। বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু স্টেটসম্যান তাতে সাংঘাতিক ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে। এমনকি তার এই প্রস্তাবে সাধুবাদ জানানোর কারণে মার্কিন দূতেরও সমালোচনা করে পত্রিকাটি।

বর্তমান জোট সরকারের শরিক দল জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে সরাসরি প্রচারণা চালাচ্ছে স্টেটসম্যান। পত্রিকাটির ভাষায়, ‘পরিস্থিতিগত প্রমাণসাপেক্ষে জামায়াতের ক্যাডাররাই এই হামলার জন্য দায়ী।’ তবে স্টেটসম্যান তাদের এই ‘পরিস্থিতির প্রমাণ’ চিহ্নিত করার কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালায়নি।

দুটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রশ্নের মাধ্যমে মি. কফার ব্লাকের সঙ্গে আউটলুকের সাক্ষাৎকার শুরু হয়। প্রশ্ন দুটি হচ্ছে : ‘বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আমেরিকার মূল্যায়ন কি?’ এবং ‘ভারত বলে যাচ্ছে বাংলাদেশে অবস্থিত সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পগুলো এতদঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর, এটা কি সত্য নয়? এ থেকে মনে হচ্ছে, আউটলুকের মতে, বাংলাদেশে সন্ত্রাসীদের ক্যাম্প থাকার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্য। অথচ বাংলাদেশে সন্ত্রাসীর এ ধরনের কোন ক্যাম্প থাকার বিষয়টি প্রমাণ করতে ভারত ব্যর্থ হয়েছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শেখ হাসিনার সাবেক সরকার এবং খালেদা জিয়ার বর্তমান সরকার ন্যাক্সারজনক বোমা হামলাকারীদের পাকড়াও করতে ব্যর্থ হয়েছে। কোন যুক্তিতে এই ব্যর্থতার কৈফিয়ত দেয়া যায় না। সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলার পর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাহায্য নেয়া হয়। কিন্তু সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এটা তেমন কোন কাজে আসেনি। যা হোক, ২০০০ সালে কোটালিপাড়ায় এবং ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকায় শেখ হাসিনার ওপর কারা বোমা ও গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে সে ব্যাপারে মি. নন্দীর মনে কোন সংশয় নেই। তার মতে, এটা হরকাতুল জিহাদ, হিকমাতুল জিহাদ প্রভৃতি নামধারী ‘ইসলামী সন্ত্রাসীদের’ কাজ। এখানেই শেষ নয়। আরও বহুদূর এগিয়েছেন মি. নন্দী। তার অভিমত অনুসারে, আফগানিস্তানের তালেবান বাংলাদেশের তালেবানকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা আফগানিস্তানে হিজবুল ইসলাম, আল কায়দা, লক্ষর-ই-তৈয়বা, জয়শ-ই-মোহাম্মদ এবং সর্বোপরি ওসামা বিন লাদেনের সংস্পর্শে এসেছে। তারা এখন ‘বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো এবং রোহিঙ্গা মুসলমান অধ্যুষিত মিয়ানমারের আরাকান পর্বত নিয়ে একটি তালেবান ধাঁচের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসী সাজসজ্জায় সংগঠিত হয়েছে।’ তিনি আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে, আফগানিস্তান রক্ষায় ব্যর্থ এসব ‘তালেবান’ এতটাই শক্তিশালী হয়ে গেছে, তারা দক্ষিণ এশিয়ার কমপক্ষে তিনটি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে এতদঞ্চলের মানচিত্র পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে যাতে একটি আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিও রয়েছে। আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এবং বিশ শতকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে দুনিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে, ‘বাঙালি তালেবান’ও সে ধরনের ক্ষমতার অধিকারী এবং তারা দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র পরিবর্তনে সক্ষম। আতংকিত মি. নন্দী উপসংহারে বলেন, ‘বাংলাদেশের কার্যকর

ফ্রন্টিয়ার এগিয়ে ক্রমশ ভারতীয় ভূখণ্ডের গভীরে চলে যাচ্ছে; এতদঞ্চলে ইসলামী সন্ন্যাসীদের আন্তর্জাতিক ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বাস্তবতার নিকটবর্তী হচ্ছে।’

জার্মান সৈনিক ও দার্শনিক কার্ল ভন ক্লজউইজ ১৮৩১ সালে যুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে ‘ভন ক্রিজ (অন ওয়ার)’ নামে একটি বই লেখেন। যুদ্ধের তথ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘যুদ্ধে প্রাপ্ত তথ্যের এক বিরাট অংশ স্ববিরোধী, তার চেয়েও বড় একটি অংশ বানোয়াট এবং এটার বেশির ভাগ অংশই সন্দেহজনক।’ ভারত এবং বাংলাদেশ দুটি বন্ধুসুলভ দেশ। নিশ্চিতভাবে দেশ দুটি যুদ্ধরত অবস্থায় নয়। এমতাবস্থায় মি. নন্দীর মতো মানুষদের বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর পেছনের উদ্দেশ্য বোঝা কঠিন।

‘বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাঙের ছাতার মতো মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা গজিয়ে ওঠা’ মি. নন্দীর খুবই অপছন্দনীয়। কারণ ‘রাজনৈতিক ইসলামকে’ তিনি ভয় পান। কিন্তু তার জানা উচিত, পাশ্চাত্যেও মসজিদ, মিনার এবং প্রার্থনার স্থান দ্রুত বাড়ছে। এ বছরের অলিম্পিক গেমস আয়োজনকারী গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে মুসলমান পর্যটকদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। আমেরিকার প্রবেশদ্বার নিউইয়র্কের জনএফ কেনেডি বিমানবন্দরে একটি ছোট মসজিদ দেখতে পেয়ে মি. নন্দী হয়তো আরও বিস্মিত হবেন। পাশ্চাত্যে ইসলাম সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার লাভকারী ধর্ম— মি. নন্দীর এই বিষয়টি না জানার কথা নয়।

একটি লিখিত সংবিধানের অধীনে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক হাজারো সমস্যা রয়েছে। আমাদের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। সর্বোপরি আমাদের রাজনীতি সংঘাতপূর্ণ। কিন্তু একটি নব্য গণতান্ত্রিক দেশে এই সমস্যাবলী নতুন কিছু নয়। কেবল মুসলমান হওয়ার অপরাধে যখন গুজরাটে শত শত এমনকি হাজার হাজার নিরপরাধ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করা হয়, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়, সম্পদ লুট করা হয়, নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়, এমনকি সংসদ সদস্য ও হাইকোর্টের বিচারকদের পর্যন্ত ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয় তখন বাংলাদেশ ছিল আশ্চর্যজনকভাবে শান্ত। যখন বাবরি মসজিদ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয় তখন বাংলাদেশে মন্দিরগুলো অক্ষত ছিল। সেগুলোতে কদাচিৎ পুলিশ প্রহরার প্রয়োজন হয়েছে। কারণ, ১৪ কোটি বাংলাদেশী যাদের ৮৮ শতাংশই মুসলমান তারা সহনশীল। মি. নন্দীর বক্তব্য অবশ্য ভিন্ন।

স্টেটসম্যান এবং হিন্দু পত্রিকার কলামিস্ট রাজা মোহন উভয়েই বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতের প্রতি খোলাখুলি আহ্বান জানিয়েছেন। স্টেটসম্যানের ভাষায়, ‘এ ঘটনাবলীর প্রতি দিল্লির উদাসীনতা বেগম জিয়া ও তার কোয়ালিশনের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। সময় এসেছে দিল্লির কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার।’ আর হিন্দু পত্রিকার ভাষায়, ‘প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা প্রকৃত অর্থে একটি যথাযথ সিদ্ধান্ত। তবু এতদঞ্চলে সংকট ঘনীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সক্রিয় হওয়ার নীতি অবলম্বন করা ছাড়া ভারতের সামনে সম্ভবত আর কোন বিকল্প থাকবে না। ভারতকে প্ররোচনামূলক কৌশল গ্রহণের পাশাপাশি এ অঞ্চলে নিজস্ব শক্তি প্রয়োগের কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

সম্ভবত ‘র’-এ ট্রেনিংপ্রাপ্ত হওয়ায় মি. নন্দীর অবস্থান কিছুটা কূটনীতিকের মতো। ‘সব দিক বিবেচনায় বিপর্যস্ত এবং অকার্যকর রাষ্ট্র বাংলাদেশকে একটি একমাত্রিক ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এবং ইসলামিক সন্ন্যাসের সূতিকাগারে পরিণত করা হয়েছে। এটা পরিণামে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে ভয়াবহ বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলতে পারে।’

বাংলাদেশের ঘটনাবলী ভারতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কাছাকাছি কিছু করতে পারে তা এক কথায় অকল্পনীয় এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক যে কোন পর্যবেক্ষকই এ কথা স্বীকার করবেন। সব দিক বিবেচনায় এ ধরনের আশংকা অমূলক। সম্প্রসারণবাদী মানসিকতা ছাড়া এ ধরনের আহ্বানের যথার্থতা কিছুতেই প্রতিপন্ন করা যায় না।

বাংলাদেশ এবং ভারত দুটি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র। কিন্তু

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশে অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝি বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে কেবল বাংলাদেশে নয়, এতদঞ্চলের সর্বত্রই ভারতভীতি বিরাজমান। সার্ক ভারতের স্থান হতে পারত উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের মতো। বোধগম্য কারণে এটা ঘটেনি এবং সম্ভবত ঘটবে না। এটা ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের এক ঐতিহাসিক ব্যর্থতা। বাংলাদেশ শান্তিপ্রিয় দেশ। অতীতে এই অঞ্চলের মানুষ অনেক দুর্যোগ, দুর্বিপাক ও ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করেছে। এখনও তারা তা করতে সক্ষম।

**ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক :** সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী